আদাব

সমরেশ বসু

১৯৪৬ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প "আদাব" প্রকাশীত হয়

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল। শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ জারী হয়েছে। দাঙ্গা বেঁধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল– চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করো লুঠেরারা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে মৃত্যু বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চীৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী-গাড়ি। তারা গুলী ছুঁড়ছে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটা গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উল্টে এসে পড়েছে গলি দু'টোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো একটি লোকা মাথা তুলতে সাহস হলো না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণা কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে কিছুই বোঝা যায় না। –'আল্লাহ-আকবর' কি বন্দেমাতরম'। হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য কয়েকটা মুহূর্ত কাটে। ...নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধহয় কুকুর তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু খানিকক্ষণ চুপচাপ আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হলো। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা...ওপাশ থেকেও উঠে এলো ঠিক তেমনি একটা মাথা মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারাধীর... স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এলো না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল–হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না–ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দু'জনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে

একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে–হিন্দু না মুসলমান?

-আগে তুমি কও অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজা সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে। ...

প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে একজন জিজ্ঞেস করে-বাড়ি কোনখানে?

-বুড়িগঙ্গার হেইপারে-সুবইডায়। তোমার?

–চাষাড়া–নারাইণগঞ্জের কাছে। ...কী কাম কর?

-নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি-তুমি?

নারাইণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে দু'জনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতো অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে। ...হঠাৎ কাছাকাছি কোথাও একটা শোরগোল ওঠো শোনা যায় দুপক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দু'জনই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠো

—ধারে-কাছেই য্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

-হ, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা মজুরের চোখের দিকে তাকাল সো। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল— বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি?তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করল—ক্যান?

—ক্যান? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল—ক্যান কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল তোমার মতলব তো ভালো মনে হইতেছে না কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারনের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই বইয়ো, মানুষের মন বোঝ না?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হলো শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও যেন কাটে মৃত্যুর প্রতীক্ষার মো। অন্ধকার গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলেমেয়েদের কথা...তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচেকথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সবা এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কি অভিশপ্ত জাত! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু'একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করে নি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খসখস শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

-হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া আর একটা কাঠি বের করল সে। মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এলো সুতা-মজুরের পাশে।

—আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহি নি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিলা দু'একবার খসখস করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

-সোভান আল্লা!—নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি ...ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

—তুমি...?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফু দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা অন্ধকারের মধ্যে দু'জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট করে উঠে দাঁড়াল। বলল-হ আমি মোছলমান।-কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল-কিছু হয় নাই, কিন্তু...

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

—পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখানা শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব, জানো?

—আর কিছু নাই তো! সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

—মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখা পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

—আরে না না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন যায়—তুমিই কও?

—হেই ত' হক কথাই। ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখ নাই তো?

—ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুঁইও নাই। পরানটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দু'জনে বসল পাশাপাশি বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগ-সহকারে দু'জনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

—আইচ্ছা...মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা আমারে কইতে পার নি—এই মাই'র-দইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ ত' তোমাগো ওই লীগওয়াললাগোই তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটুক্তি করে উঠল—হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী? তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?

—আরে আমিও তো হেই কথাই কই হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সো—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইবা এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারলা। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুড় পায়ের উপুড় পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি নাইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেমবায়?—নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু'হাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে জড়িয়ে ধরে।

-হ।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন সুমুন্দি নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতো বাবুর হাত য্যান হজরতের হাত, বখশিশ দিত পাঁচ, নায়েব

কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে!

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

-কী করবো? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

—চল পলাই। কিন্তুক যামু কোনদিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না—ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

-হ। ঠিক কথাই কইছ। কোনদিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এই দিকে। —

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি বলল, চল, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুইজনেই একবার থমকে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড়-ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়ে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্বখুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল

—কিনারে কিনারে চলা সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—খাড়াও মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

-কী হইল?

—এদিকে আইয়ো-সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

-হেদিকে দেখ।

মাঝির সঙ্কেতমতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত মুখ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলই পাটুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে—ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল-তবে?

—তাই কইতাছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত যাইবা গা।

—আর তুমি?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।-আমি পারুম না ভাই থাকতো আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানো কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুঙ্গিঙ্গা।

—আরে না না মিয়া, কর কী? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।-কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না, ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিনব, বাপজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠো কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

-যদি তোমায় ধইরা ফেলায়? ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠো

—পারব না ধরতে, ডরাইও না এইখান থাইকা য্যান উইঠো না যাই...ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। —আদাব।

—আমি ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপেটিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুকধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উত্তর্ণ হয়ে রইল সে, ভগবান—মাঝি য্যান বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিশ্বাসে অনেকক্ষণ তো হলো, মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করে পরবে! বেচারা বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?' সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে?মাঝি তখন—

—হলট...

ধ্বক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চীৎকার করে।

—ডাকু ভাগতা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম, গুড়ুম। দুটো নীলচে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির—বুকের রক্তে তার পোলামাইয়ার, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

লেখক পরিচিতি -

শৈশব ও কৈশোর

তার শৈশব কাটে বাংলাদেশের বিক্রমপুরে আর কৈশোর কাটে ভারতের কলকাতার উপকণ্ঠ নৈহাটিতে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় তার জীবন ছিল পরিপূর্ণ। যেমন: এক সময় মাথায় ফেরি করে ডিম বেচতেন তিনি।

কর্মজীবন

বিচিত্র বিষয় এবং আঙ্গিকে নিত্য ও আমৃত্যু ক্রিয়াশীল লেখকের নাম সমরেশ বসু। দেবেশ রায় তার মৃত্যুতে লেখা রচনাটির শিরোনামই দিয়েছিলেন, 'জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি লেখক এবং পেশাদার লেখক' (প্রতিক্ষণ, ৫ম বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২-১৬ এপ্রিল ১৯৮৮)। লিখেছিলেন, 'তিনি আমাদের মতো অফিস-পালানো *কেরানি লেখক* ছিলেন না, যাঁদের সাহস নেই লেখাকে জীবিকা করার অথচ ষোল আনার ওপর আঠারো আনা শখ আছে লেখক হওয়ার।'

রাজনৈতিক জীবন ও কারাবাস

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি ইছাপুরের বন্দুক ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। এ কারণে তাকে ১৯৪৯-৫০ সালে জেলও খাটতে হয়। জেলখানায় তিনি তার প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' রচনা করেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

ছদ্মনাম

কালকূট মানে তীব্র বিষ। এটি ছিল তার ছদ্মনাম। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে' সহ অনেক উপন্যাস তিনি এ নামে লিখেছেন। বহমান সমাজ থেকে বাইরে গিয়ে একান্তে বেড়াতে ঘুরে বেরিয়েছেন আর সে অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন ভ্রমণধর্মী উপন্যাস । হিংসা, মারামারি আর লোলুপতার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে তিনি অমৃতের সন্ধান করেছেন। তাই কালকূট নাম ধারণ করে হৃদয়ের তীব্র বিষকে সরিয়ে রেখে অমৃত মন্থন করেছেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। *অমৃত বিষের পাত্রে, মন মেরামতের আশায়, হারায়ে সেই মানুষে, তুষার শৃঙ্গের পদতলে* ইত্যাদি এই ধারার উপন্যাস ।

ভ্রমর ছদ্মনামে লেখা তিনটে উপন্যাস ১৩৮৯, ১৩৯০ ও ১৩৯১ বঙ্গাব্দের শারদীয়া *প্রসাদ*এ প্রকাশিত হয়:'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' , 'প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত' , 'প্রেম - কাব্য - রক্ত'।

পুরস্কার

ছদ্মনামে লেখা শাম্ব উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮০ সালের আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সাহিত্য কর্ম

লেখক হিসেবে সমরেশ আমৃত্যু যে লড়াই করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। তার নিজের জীবনই আরেক মহাকাব্যিক উপন্যাস। 'চিরসখা' নামের প্রায় ৫ লাখ শব্দের বিশাল উপন্যাসে সেই লড়াইকে স্মরণীয় করে রেখেছেন তারই পুত্র নবকুমার বসু। ছোটদের জন্যে তার সৃষ্ট গোয়েন্দা গোগোল অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। গোগোলকে নিয়ে বহু ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন যা শিশুসাহিত্য হিসেবে সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গোগোলের দুটি কাহিনি গোয়েন্দা গোগোল ও গোগোলের কীর্তি নামে চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে।

উপন্যাস সমরেশ বসু প্রণীত উপন্যাসের সংখ্যা ১০০।

- *উত্তরঙ্গ*
- *গঙ্গা*
- *বিবর*

- প্রজাপতি
- দেখি নাই ফিরে
- সওদাগর
- কোথায় পাবো তারে
- নয়নপুরের মাটি
- বাঘিনী
- চলো মন রুপনগরে
- পাতক
- মুক্তবেণীর উজানে
- টানাপোড়েন
- স্বীকারোক্তি
- অপদার্থ
- সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা
- যুগ যুগ জীয়ে
- মহাকালের রথের ঘোড়া
- শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে
- বাঘিনী
- বিপর্যস্ত
- শাস্ব
- বিটি রোডের ধারে
- শ্রীমতি কাফে
- অবশেষে
- আম মাহাতো
- কামনা বাসনা
- কে নেবে মোরে
- খন্ডিতা
- গোগোল চিক্কুস নাগাল্যান্ড
- ছায়া ঢাকা মন
- জঙ্গল মহলের গোগোল
- জবাব
- তিন পুরুষ
- দাহ
- নাটের গুরু
- নিঠুর দরদী
- পথিক
- প্রাণ প্রতিমা
- বাঘিনী
- বিদেশী গাড়িতে বিপদ

- *বিবেকবান/ভীরু*
- *ভানুমতী ও ভানুমতীর নবরঙ্গ*
- *মহাকালের রথের ঘোড়া*
- *রক্তিম বসন্ত*
- *শিমুলগড়ের খুনে ভূত*
- *শেখল ছেঁড়া হাতের খোঁজে*
- *সেই গাড়ির খোঁজে*
- *স্বর্ণচঞ্চু*
- *হৃদয়ের মুখ*

উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ

তার প্রকাশিত ছোটগল্পের সংখ্যা ২০০।

গল্পগ্রন্থ:---

মরশুমের একদিন(১৯৫৩), অকাল বৃষ্টি(১৯৫৩), ষষ্ঠ ঋতু(১৯৫৬),বনলতা(১৯৬৭), পাপপুণ্য (১৯৬৭), শ্রেষ্ঠ গল্প(১৯৬৭), হ্রেষাধ্বনি(১৯৭৩), কামনাবাসনা(১৯৭২), নাচঘর(১৯৭৬),কুন্তীসংবাদ(১৯৭৬) ,বিবরমুক্ত(১৯৮০), ছায়াচারিনী(১৯৮৩), বাছাই গল্প(১৯৮৫), ছোট ছোট ঢেউ(১৯৭৭), বিবেকবান ভীরু(১৯৮৬) প্রভৃতি।

কিশোর সাহিত্য সমূহ:

মোক্তার দাদুর কেতু বধ(১৯৭৫), বদ্ধ ঘরের আওয়াজ(১৯৭৯), গোগল চিক্কুস নাগাল্যান্ডে(১৯৮৩), সেই গাড়ির খোঁজে(১৯৮৪), ভুল বাড়িতে ঢুকে(১৯৮৬), জঙ্গল মহলে গোগল(১৯৮৭), বিদেশী গাড়ির বিপদ(১৯৮৮)।।

পুরস্কার

তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন।

মৃত্যু

সমরেশ বসু ১৯৮৮ সালের ১২ মার্চ মারা যান। মৃত্যুকালেও তার লেখার টেবিলে ছিল দশ বছরের অমানুষিক শ্রমের অসমাপ্ত ফসল শিল্পী রামকিংকর বেইজের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস *দেখি নাই ফিরে*। এই উপন্যাসের চিত্রাঙ্কন করেন প্রচ্ছদ শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য।